একজন সুপরিচিত সক্রিয় কর্মী মালবীয়-র আশ্রিত ব্যক্তি ইন্দর নারায়ণ দ্বিবেদী ধর্মীয় বক্তৃতা ও হিন্দী ভাষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৭-য় হোম রুল রাজনীতি ও কিসান সভার একাধিক শাখার পত্তন করেন। সেপ্টেম্বর ১৯১৮-য় কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে খানিকটা খুঁটিয়ে চর্চা করেছেন জে এইচ ব্রুমফিল্ড। বড়বাজারের মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী আরও গরিব মুসলমানরা। আংশিকভাবে কিছু অবাঙালি মুসলমান বিক্ষোভকারী (হাবিব শাহ্, ফজলুর রহমান, কালামি) ও পশ্চিমের উলেমাদের সর্ব-ইসলামী প্রচারেই তাঁরা খেপে উঠেছিলেন। হিন্দু পুনরুত্থানবাদ ও সর্ব-ইসলামবাদ—এই দুই-ই নিচু শ্রেণীর অসন্তোষের প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতির মধ্যে দোলাচল করতে পারত।

জাতপাতের আন্দোলন

বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলিতে জাতি সম্মিলন, সমিতি ও আন্দোলনের সংখ্যাবৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের সংস্থা গড়ে তুলেছিল মাঝারি বা আরও বিরল নিচু জাতের শিক্ষিত মানুষের বেশ ছোটোছোটো কয়েকটি গোষ্ঠী। পেশা বা চাকরির প্রতিযোগিতায় তাঁরা এসেছিলেন পরে। এগিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উঁচু জাতের লোকদের (তাঁরাই সাধারণত ছিলেন ইংরিজি শিক্ষার প্রথম সুবিধাভোগী) বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যাপারে জাতপাতের মধ্যেই তাঁরা লোক-জোটানোর একটা উপযোগী ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা যে এই উপদলীয় দিকটিতে জোর দেন সেটি অপ্রত্যাশিত নয়, আর সমাজতাত্ত্বিকদের ধারা হলো, জাতপাতের আন্দোলনের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে কোনো কোনো বিশেষ জাতের 'সংস্কৃতায়নে'র মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সম্পর্ক স্থাপন, আর কখনও কখনও 'পরম্পরা' ও 'আধুনিকতা'র মধ্যে মূল্যবান যোগসূত্র হিসেবে তাঁরা এইসব জাতি সমিতির তারিফ করেছেন। মহারাষ্ট্রে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনের ওপর সাম্প্রতিক কালের খুবই কৌতূহলজনক একটি গবেষণায় গেল ওমভেট তৃতীয় ধরনের একটি পরিমার্গ করে নিয়েছেন ঃ সামাজিক-আর্থিক ও শ্রেণীগত টানাপোড়েনের বিকৃত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রকাশ হিসেবে জাতিসঙ্ঘাতকে ব্যাখার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সংস্কৃতায়নে'র ধারণাটি তাঁর কাছে খুবই সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছে, কারণ এটি মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক সমাজ বা তামিলনাড়ুর আত্ম মর্যাদা প্রচারের মতো কিছু র‍্যাডিকাল ও জনমুখী জাতপাত-বিরোধী আন্দোলনের অভ্যুদয়ের ব্যাখ্যা করতে পারে না।

বাঙলার মতো প্রদেশে জাতি-সমিতির যে কোনো চল ছিল না এমন নয় (১৯০৮-এর পর জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়ায় তা আরও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে), কিন্তু দক্ষিণ-ভারত ও মহারাষ্ট্রে এই সব সমিতি অনেক বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই এলাকাগুলোয় স্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্য-প্রধান্য ও উঁচু জাতের কড়াকড়ির চিহ্ন ছিল খুবই প্রকট (যেমন, কেরলে শুধু নিচু জাতের ছোঁয়ায়ই নয়, নজরে পড়লেও শুচিতা নষ্ট হয় বলে মনে করা হতো)। দক্ষিণ তামিলনাড়ুর অচ্ছুত নাদারদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষভাগ থকে রামনাড জেলার শহরগুলিতে একটা সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দেখা দিয়েছিল। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তাঁরা সবাই মিলে চাঁদা তুলতেন, ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দাবি করতেন, উঁচু শ্রেণীর আচার-

Scanned with CamScanner

আচরণ নকল করতেন, আর ১৯১০-এ গড়ে তোলেন না দা র ম হা জ ন স ঙ্ঘ ম। 'সংস্কৃতায়নের নকশাটি এখানে বেশ উপযোগী বলে মনে হয়, যদি মনে রাখা হয় যে, এই ধরনের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা তিরুনেলভেলির নিচু জাতের পাসিদের (তাড়ির জন্যে যাঁরা তাল গাছে ওঠেন) ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে নি। যখন রামনাডে তাঁদের সফল জাতভাইরা আরও মর্যাদাসূচক পদবি 'নাদার' পদবিটি দখল করে ফেলেছিলেন, তাঁদের তখনও পুরনো জাত-নাম 'শানার'ই বলা হতো। রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হলো, ১৯১৫-১৬ নাগাদ মাদ্রাজে মাঝারি জাতের (তামিল, ভেল্লাল, মুদালিয়র ও চেট্টিয়ার, কিন্তু সবার ওপরে, তেলুগু রেড্ডি, কাম্মা ও বালিজা নাইডু এবং মালয়ালী নায়াররা) তরফে সি এন মুদালিয়র, টি এম নায়ার, ও পি ত্যাগরাজ চেট্টি-র প্রবর্তিত 'ন্যায়বিচার' (জাস্টিস) আন্দোলন। এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিস্তর সমৃদ্ধ ভূস্বামী ও বণিক। তাঁরা তাই শিক্ষা, চাকরি ও রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিষয়ে ঈর্ষাবোধ করছিলেন। ১৯১২-য় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.২% ব্রাহ্মণ ৫৫% ডেপুটি কালেক্টর-এর পদ ও ৭২.৬% জেলা মুন্সেফের পদ অধিকার করেছিলেন। কখনও কখনও ব্রাহ্মণরাও ছিলেন বড় ভূস্বামী, বিশেষ করে তাঞ্জাভুরে। কৃষিকর্ম ও নাগরিক বৃত্তিগুলি—উঁচু জাত হিসেবে তাঁদের নিষিদ্ধ থাকায় সাধারণত তাঁরা অনুপস্থিত ভূস্বামী হয়েই থাকতেন। অ্যানি বেসান্ট-এর ব্রাহ্মণ প্রধান হোম রুল লীগ বিক্ষোভ তাঁদের মনে ভয় জাগিয়ে তুলেছিল, আর উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী, সাংবাদিক ও মাদ্রাজের ব্যবসাদাররা অচিরেই তার সুযোগ নেয়। *মাদ্রাজ মেল*-এর সম্পাদক ও মাদ্রাজ শহরে ব্রিটিশ ব্যবসার স্বার্থের মুখপাত্র টি আর্ল ওয়েল্‌বি, মণ্টাগু-র প্রতিশ্রুত দায়িত্বশীল সরকারের প্রস্তাবকে প্রবল আক্রমণ করেন ('ইংল্যান্ডের নিনাদ আর তাদের জানা সিংহনিনাদ নয়, তা হয়ে উঠল এই ভবঘুরে ইহুদি-র ফিসফিসানি'—*মাদ্রাজ মেল*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) এবং উদীয়মান জাস্টিস দলকে আনুকূল্য করতে শুরু করেন। সেই দলও আরও বেশি পরিষেবার কাজ ও নতুন আইনসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের আশায় তাদের রাজভক্তি জাহির করল। ২০ ডিসেম্বর ১৯১৬-য় প্রকাশিত হয় 'অব্রাহ্মণ ইশ্‌তেহার'। 'একমাত্র ব্রিটিশ শাসকই ধর্মমত ও শ্রেণীর মধ্যে পাল্লা সমান রাখতে পারে...তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্বের পক্ষে হানিকর' যে-কোনো প্রয়াসেরই তাতে বিরোধিতা করা হয়। মৈত্রী আরও সহজ হয়েছিল এই কারণে যে, জাস্টিস দলের নেতারা ছিলেন ভূস্বামীদের অর্থের ওপর প্রচন্ড ভাবে নির্ভরশীল এক শিরোমণি গোষ্ঠী। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-য় জাতীয়তাবাদ-প্রবণ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সমিতি-র সংগঠন থেকে দেখা যায়, অব্রাহ্মণ ক্ষোভগুলি ছিল যথেষ্ট বাস্তব। আলাদা প্রতিনিধিত্বের দাবিও তাঁদের ছিল—আর ১৯২০-র দশকের শেষেই ভি রামস্বামী নায়কর-এর নেতৃত্বে একটি র‍্যাডিকাল ও জনমুখী ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও জাতপাত-বিরোধী আন্দোলনও গড়ে ওঠে।

রাজন্যশাসিত মাইশোর রাজ্যে ১৯১৮-য় প্রধানত শহরবাসী একটি ব্রাহ্মণগোষ্ঠী (মোট জনসংখ্যার ৩.৮% ভাগ) গেজেটেড পদ অধিকার করে ছিল। বোক্কালিগা ও লিঙ্গায়ত-রাই ছিলেন মুখ্য গ্রামীণ গোষ্ঠী। ১৯০৫-০৬-এ একটি লিঙ্গায়ত শিক্ষা তহবিল সমিতি ও বোক্কালিগা সঙ্ঘ দেখা দেয়। আর ১৯১৭-য় জনৈক মাদ্রাজী অব্রাহ্মণ রাজনীতিবিদ্ ও মাইশোরের মহারাজা কলেজের অধ্যাপক সি আর রেড্ডি ব্রাহ্মণ-বিরোধী অবস্থান থেকে এই রাজ্যের প্রথম

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক সংগঠন—প্রজা মিত্র মণ্ডলী—পত্তন করেন। অবশ্য এই সব সংস্থাই নাগরিক বৃত্তিজীবীদের জোটই রয়ে গিয়েছিল, যারা শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দরবারি রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করত।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের ছোটো শিরোমণি গোষ্ঠী (জনসংখ্যার ১%-এরও কম) বড় নিদ্দর 'জেন্‌মি' ভূসম্পত্তি থেকেই জীবন ধারণ করত। শিক্ষা ও চাকরির প্রতিযোগিতা থেকে তারা অনেকটাই দূরে সরে থাকত। অবশ্য অ-মালয়ালী ব্রাহ্মণরা (মারাঠি দেশস্থ বা তামিল বংশ-জাত) রাজ্য প্রশাসনে একটা সুবিধাভোগী অবস্থা ভোগ করতেন। ১৮৯১-এ স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী জাত নায়ারদের শক্তির (৫০ লক্ষ) বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মাত্র ২৮,০০০। ত্রিবাঙ্কুরের জীবনধারায় একটা অস্বাভাবিক বিশেষত্ব ছিল বিশাল সংখ্যক সাক্ষর মানুষ। খ্রীস্টানদের এই পুরনো কেন্দ্রে এজাভা ও অন্যান্য নিচুজাতের মধ্যে প্রবল ধর্মপ্রচারমূলক কার্যকলাপ ও দেওয়ান মাধব রাও-এর আমলে (১৮৬০-৭২) উঁচুজাতের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টার ফলে এটি ঘটেছিল। ১৯০১-এ ত্রিবাঙ্কুরের শহর অঞ্চলে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৬%—কলকাতার চেয়েও বেশি। নায়ারদের মনে হতো, অ-মালয়ালী ব্রাহ্মণরা তাঁদের (সমাজের) বাইরে রেখে দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে ছিলেন সিরীয় খ্রীস্টানরাও (একটি সম্প্রদায়, যাঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের বহু ভূস্বামী ও সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী, আর তাঁরাই ছিলেন আধুনিক সাংবাদিকতার অগ্রদূত)। তাঁদের ও এজাভাদের মধ্যে ঊর্দ্ধমুখী গতির সূচনাও ছিল নায়ারদের আশঙ্কার কারণ। নায়ারদের বহু অভ্যন্তরীণ সমস্যাও ছিল ঃ নায়ারদের পরম্পরাগত অব্যবহার্য 'তারাবাদ' (মাতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবার) ক্রমাগতই আধুনিক আর্থনীতিক অবস্থায় অচল বলে বোঝা যাচ্ছিল ; বহু 'তারাবাদ' তুলনায় ছোটো ভূ-খণ্ড অধিকার করেছিল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মার খাচ্ছিল (অন্যান্য প্রদেশের বাবু-ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিজীবী সম্প্রদায় যে-অবস্থার মুখে পড়েছিলেন, এখানেও তা-ই তৈরি হচ্ছিল)। পাশ্চাত্য শিক্ষার দরুন নায়ারদের বহু সামাজিক প্রথা অস্বস্তিকর ও পশ্চাদ্‌মুখী বলে মনে হচ্ছিল, বিশষ করে এই নিয়মটি যে, নাম্বুদ্রি অতিথির সামনে নায়ার নারীকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে আসতে হবে ও তার সঙ্গে সাময়িক দেহ সম্বন্ধ ('সম্বন্ধনম্') স্থাপন করতে হবে।

এর মিলিত ফল হলো গোড়াতেই ও প্রায় একই সঙ্গে অনেক ক'টি প্রবণতার উত্থান ঃ সমাজ সংস্কার, ব্রাহ্মণ-বিরোধী ভাবাবেগ, স্বাদেশিকতা, এমনি কিছুটা র‍্যাডিকালিজম। কেরলের প্রধান আধুনিক উপন্যাস, চন্দর মেননের *ইন্দুলেখা*-য় (১৮৮৯) তাই নাম্বুদ্রিদের সামাজিক প্রাধান্য এবং রোমান্টিক প্রেমের ওপর 'তারাবাদ' কড়াকড়িকে আক্রমণ করা হয়। আর সি ভি রামন পিল্লাই-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস *মর্তণ্ড বর্মা*, (১৮৯১)-য় তার নায়ক আনন্দ পদ্মনাভন-এর মাধ্যমে নায়ারদের লুপ্ত সামরিক গৌরবকে স্মরণের চেষ্টা করা হয়। রামন পিল্লাই ছিলেন ১৮৯১-এর 'মালায়ালী স্মারকলিপি'র মুখ্য সংগঠক। এই স্মারকলিপিতে রাজ্যের চাকরিতে ব্রাহ্মণ-প্রধান্যকে আক্রমণ করা হয়—প্রাথমিকভাবে এটি ছিল নায়ারদের প্রয়াস, যদিও কিছু খ্রীস্টান ও এজাভা তাতে সই দিয়েছিলেন। যখন রামন পিল্লাই-এর গোষ্ঠীকে ১৮৯০-এর দশকের শেষে বেশ সহজেই সরকারি শিরোমণিদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল, সেই সময়ে কে রামকৃষ্ণ পিল্লাই ও মন্নাথ পদ্মনাভ পিল্লাই-এর নেতৃত্বে ১৯০০-র পরে আরও তেজীয়ান

Scanned with CamScanner

একটি নায়ার নেতৃত্ব উঠে আসে। মন্মথ পদ্মনাভ পিল্লাই ১৯১৪-য় নায়ার সেবা সমিতি-র পত্তন করেন, যা এখনও আছে। জাতপাতগত সাধবাঞ্ছার সঙ্গে তাঁরা খানিকটা অভ্যন্তরীণ সমাজ-সংস্কারও যুক্ত করেছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত কে রামকৃষ্ণ পিল্লাই *স্বদেশাভিমানী*-র সম্পাদক ছিলেন। দরবারকে আক্রমণ ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করার দরুন তাঁকে ত্রিবাঙ্কুর থেকে বার করে দেওয়া হয়। টি এম নায়ার-এর জাস্টিস আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল, কিন্তু ১৯১৬-য় অকালমৃত্যুর দু-বছর আগে তিনি মালয়ালম ভাষায় প্রথম কার্ল মার্কস-এর জীবনীও প্রকাশ করেছিলেন।

এই ধরনের বহুমুখী কাজকর্ম নায়ারদেরই একচেটিয়া ছিল না। ধর্মীয় নেতা শ্রী নারায়ণ গুরু (আনু. ১৮৫৫-১৯২৮) ও তাঁর অরুবিপুরম্ মন্দিরকে কেন্দ্র করে জাগরণ ঘটছিল এজাভাদের। এরা পরম্পরাগতভাবে নিচু জাতের পাসী ও নারকোল গাছের মালি। নারকোলজাত দ্রব্যের বাজার বাড়ার ফলে, তুলনায় সম্পন্ন একটা অংশ হিসেবে তাঁরা বেড়ে উঠছিলেন। শ্রী নারায়ণ গুরু, এজাভাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক ড. পাল্লু এবং মহান মালয়লি কবি এন কুমারন আসান ১৯০২-০৩-এ স্থাপন করেন শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম্। কুইলনে (জানুয়ারি ১৯০৫) তাদের সংগঠিত সফল শিল্পমেলার পরেই দেখা দিল একের পর এক নায়ার-এজাভা দাঙ্গা। ১৯২০-র দশকে টি কে মাধবনের নেতৃত্বে এই যোগম্ গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। আর এজাভাদের পরের প্রজন্ম নির্দ্বিধায় চলে গেলেন কমিউনিস্টদের দিকে। সমাজ সংস্কার (গোড়ার দিকে যার কাজ চলত প্রায়শই জাতি সমিতির মাধ্যমে) থেকে পুরোদস্তুর র‍্যাডিকালিজম-এ দ্রুত উত্তরণ—বাস্তবে এ-ই হয়ে দাঁড়াল কেরল জীবনের এক পুনরাবৃত্ত লক্ষণ ঃ ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদও ১৯২০-র দশকে নাম্বুদ্রি কল্যাণ সমিতি-র সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন।

কিন্তু জাতপাত আন্দোলনের সবচেয়ে আগ্রহজনক দিক ছিল মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক সমাজের আন্দোলন। গেল ওমভেট-এর গবেষণা থেকে দেখা যায়, তার দুটি পৃথক ধারা ছিল। প্রথম ধারাটি ছিল অনেকটাই মাদ্রাজের জাস্টিস আন্দোলনের মতো। কোল্হাপুরের রাজা শাহু-র (ব্রাহ্মণ সভাসদদের সঙ্গে যাঁর নিজেরই ঝগড়া ছিল) পৃষ্ঠপোষণের ওপর এটি অনেকটাই নির্ভর করত। তার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত ছিল শিরোমণিদের জন্যে আরও চাকরি ও রাজনৈতিক আনুকূল্য পাওয়ার দিকে। কিন্তু আরও অনেক বেশি জনমুখী ও র‍্যাডিকাল একটি ধারাও ছিল। 'বহুজন সমাজ'-এর নামে 'শেঠজী' ও 'ভাটজী' (ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কিন্তু বণিকও বটে, আর সাধারণভাবে ধনীও)-দের বিরুদ্ধে সেটি সোচ্চার হওয়ার দাবি করত। মুকুন্দরাম পাটীল ১৯১০ ইস্তক তাঁর নিজের গ্রাম তারাভিদে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যশোধক পত্রিকা *দীনমিত্র* বার করতেন। বস্তুত গোটা সত্যশোধক রচনাপত্র ছিল মারাঠি ভাষায়, ইংরিজিতে নয়—এর থেকেই তার জনমুখী চরিত্রটি ভালোভাবে ধরা পড়ে। মুকুন্দরামের মতো নেতাদের পরিচালনায় এই সমাজ মহারাষ্ট্রের ডোকান ও বিদর্ভ-নাগপুর অঞ্চলে এক অনন্য গ্রামীণ ভিত্তি লাভ করেছিল। এই সমাজের ১৯১৭-র বাৎসরিক সম্মিলনে ১৪টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা ৪৯টি শাখার প্রতিবেদন পাওয়া যায়। তার মধ্যে কমপক্ষে ৩০টি স্থানীয় সংগঠন ছিল ২০০০-এর কম অধিবাসীর গ্রামে। এই স্তরের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জাতপাতের নিপীড়ন ও সামাজিক ক্রমবিন্যাস বর্জন, চলতি কাঠামোর

Scanned with CamScanner

মধ্যে উঁচু পদমর্যাদার জন্যে সংস্কৃতায়ন করার দাবি নয়। নিঃসন্দেহে, এর সামাজিক ভিত্তি ছিল মুখ্যত ধনী কৃষকরা, কিন্তু এই পর্বে ব্যাপকভাব উঁচু জাতের মহাজন ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষককুলের কয়েকটি সাধারণ স্বার্থ ছিল। সত্যশোধকদের বার্তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল পরম্পরাগত লোকনাট্য বা 'তামাশা'কে নতুন রূপ দেওয়ার মাধ্যমে (১৯৪০-এর দশকে কমিউনিস্টরা আবার এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ভেতর দিয়ে)। সাতারা-য় (যেখানে এই ধরনের বহু তামাশা দল খুবই সক্রিয় ছিল) ১৯১৯-এ স্থানীয় সত্যশোধক নেতাদের পরিচালনায় এক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে।

আঞ্চলিক ভাবাবেগ ও ভাষা

আমাদের আলোচ্য পর্বে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল ভষাগত দিক দিয়ে আঞ্চলিক ভাবাবেগের বিকাশ। শিক্ষিত যুবকদের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির আরও অনেক গভীরে শেকড় চারিয়েছিল, যেহেতু তার যোগ ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় শক্তিশালী সাহিত্যসংস্কৃতি-গত নানা ধারার উদ্ভবের সঙ্গে। ১৯১১ নাগাদই মাদ্রাজের অন্ধ্র জেলাগুলিতে আলাদা প্রদেশের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। গুন্টুর-এর *দেশাভিমানী*-র মতো পত্রিকার মাধ্যমে চাকরির ক্ষেত্রে তেলেগুদের কম প্রতিনিধিত্বের অভিযোগ ওঠে। এই আন্দোলনে তা ইন্ধন জোগায়। আর একে অনুপ্রাণিত করেছিল *অন্ধ্রুলা চরিত্রামু*-র মতো রচনাও। বার্ষিক অন্ধ্র সম্মিলন (পরে এর নাম হয় অন্ধ্র মহাসভা)-এর অনুষ্ঠান হতে থাকে ১৯১৩ থেকে। তার প্রস্তাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহারের দাবিও তোলা হয়। প্রধান সমর্থন এসেছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে। এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ নগরবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাপক কৃষক-স্তরের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এর ফলে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে এখানেই রাজনৈতিক বিক্ষোভের ব্যাপকতর ক্ষেত্র তৈরি হয়। অন্ধ্র-আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন কোন্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়্যা ও পট্টভি সীতারামাইয়্যা-র মতো জাতীয় নেতারা। ১৯১৮-য় কংগ্রেস তার নিজেদের সংগঠনের মধ্যে পৃথক 'অন্ধ্রমণ্ডল'-এর দাবিটি মেনে নিয়েছিল।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সুস্পষ্ট দাবি তখনও পর্যন্ত উঠেছিল একমাত্র অন্ধ্রেই, তবে নানা ধরনের, কখনও বা পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক প্রবণতাকে লালন করছিল আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশই। আমরা যেমন দেখেছি, সমাজ-সংস্কার ও দেশপ্রেমের শক্তিশালী বাহন হয়ে উঠেছিল মালয়লম। ১৯০৮-এ এজাভা কবি কুমারন আসান লিখেছিলেন : 'মা গো, তোর দাসত্বই তোর নিয়তি! তোর সন্তান আজ জাতের নামে অন্ধ, শুধুই হানাহানি করে নিজেদের মধ্যে / আর মরে ; স্বাধীনতা তবে কিসের জন্যে?' ১৯২০-র দশকে কেরলে গান্ধীপন্থী ভাবধারা প্রচারের মুখ্য শক্তি হয়ে উঠবে ভাল্লাথোল-এর কবিতা। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনগুলির সঙ্গে মাদুরা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য শহরে তামিল সঙ্গম প্রতিষ্ঠার যোগ ছিল। তার ফলে আগ্রহ জেগে উঠল প্রাচীন তামিল ধ্রুপদী সাহিত্যে, আর দক্ষিণের সংস্কৃত-পূর্ব ও অনার্য 'দ্রাবিড়' উত্তরাধিকারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হলো। রামের বিরুদ্ধে রাবণকে মহিমান্বিত করার জন্যে উল্টে দেওয়া হলো রামায়ণকে। এও কৌতূহলের যে, কখনও কখনও মহারাষ্ট্রেরও সত্যশোধকদের প্রচারের মধ্যে রামের হাতে অস্পৃশ্য শম্বুকের নিধন নিয়েও

Scanned with CamScanner

অনেকটাই সভা আর ইস্তাহার বিলি করার গণ্ডিতেই আটকে ছিল, যদিও থানা, কোলাবা ও রত্নগিরির মতো জেলায় এক ধরনের স্বল্পস্থায়ী রাজস্ব-বন্ধ জোটও চালু করা হয়। জনগণের চাপে ও তার সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর কিছু উদ্যোগে আবার এখানে তারই পূর্বসূচনা দেখা যায়, গান্ধীর নেতৃত্বে যা হয়ে উঠেছিল বাঁধাগত জাতীয়তাবাদী কৌশল। ফডকে-র আন্দোলনের মতোই, জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ-প্রচারকরা সরে দাঁড়ানোর পরেও জন-প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্য বিভাগে (মহারাষ্ট্রের মধ্যভাগ, পুণার চারধারে) রাজস্ব না-দেওয়ার দরুন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের ঘটনার বার্ষিক গড় ১৮৯২-৯৭-এ ২৬ থেকে বেড়ে ১৮৯৭-৯৮-এ ১৯৪ ও ১৮৯৮-৯৯-এ ২২৬৯ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৯৯-১৯০০-র দুর্ভিক্ষের পর সুরাট, নাসিক, খেড়া, আহ্‌মেদাবাদ, ও আশপাশের জেলা থেকে ধনী চাষী ও মহাজনদের নেতৃত্বে রাজস্ব-বন্ধ জোটের কথা শোনা যায়, যদিও পূর্ব-পুণা সার্বজনিক সভা ততদিনে মেটামুটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

এতক্ষণ আমরা যে-ধরনের সঙ্ঘাত অনুধাবন করেছি, সব সঙ্ঘাতই যদি সেই ধরনের হতো—অর্থাৎ, দিকু, মহাজন, জমিনদার ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শোষণের বিরুদ্ধে মোটের ওপর সরাসরি প্রতিরোধ আন্দোলন—তবে আধুনিক ভারতের ইতিহাস হতো তুলনায় অনেক সরল। কিন্তু ভারতীয়দের বিশাল সংখ্যাগুরু অংশ জাতপাত বা ধর্মের নিরিখে ভাগাভাগিতে অভ্যস্ত ছিল। প্রায়শই তা শ্রেণীগত পার্থক্যকে ছাপিয়ে যেত বা আবছা করে দিত। ঔপনিবেশবাদকে প্রায়ই আধুনিকীকরণের শক্তি হিসেবে দাবি করা হয়; বাস্তবে কিন্তু নানা উপায়ে তা পরম্পরাগত আনুগত্যকেই জোরদার করেছিল।

জাতপাতের চেতনা

জাতপাত নিয়ে হালের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি বিষয়ের ওপর বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেটি হলো : এই অর্থবহ এককগুলি এখানে ঠিক বিমূর্ত অর্থে 'বর্ণ' নয় (সংস্কৃত রচনা যেমন তত্ত্বগত সর্বভারতীয় সোপানের বর্ণনা আছে),' এ হলো নানা স্থানীয় 'জাতি'র সমাহার; পেশাগত অভিন্নতা, সাধারণ আচার-অনুষ্ঠান, আর গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে বা খাওয়া-দাওয়া বাধানিষেধের নানা মাত্রা দিয়ে তা একত্র। জাতপাতের চূড়ান্ত অনড় ও অপরিবর্তনীয় সোপানের পুরনো ধারণাও বর্জন করা হয়েছে। পরম্পরাক্রমে উঁচু গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার ও বাধানিষেধ ধার করে অন্যান্য জাত নিজেদের আরও উন্নত মর্যাদার কথা জাহির করছে—সাম্প্রতিক ও তত-সাম্প্রতিক নয় এমন অতীতে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করা হয়েছে। একেই এম এন শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন'-প্রবণতা আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে পাকাপাকি কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না, উদ্বৃত্ত জমি থাকার ফলে দেশান্তরে যাওয়া যেত অনায়াসে। তার ফলে জাতপাতের সচলতাও ছিল সহজ। যেমন, মধ্যযুগের বাঙলায় সদ্গোপরা আদতে ছিলেন গোয়ালা 'গোপ' সম্প্রদায়। সেখান থেকে তাঁরা চাষী ও ব্যবসাদারে উন্নীত হন। দেশান্তরী হয়ে তাঁরা চলে আসেন বাঙলা-বিহার সীমানার অহল্যাভূমিতে, কখনও কখনও স্থানীয় প্রতিপত্তিও অর্জন করেন। ঔপনিবেশিক পর্বে এসব পথ বন্ধ বা খর্ব হয়ে যায়, কিন্তু খুলে যায় অন্যান্য রাস্তা। নতুন রাজত্ব বার করে নেওয়া ছিল অসম্ভব, অহল্যাভূমিও ক্রমেই আসছিল

কমে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ব্যাপকতর সংযোগ সম্ভব হয়েছিল। ছোটো কিন্তু বাড়ন্ত সংখ্যালঘু অংশের কাছেও ইংরিজি শিক্ষা হয়ে উঠছিল আরও বেশি করে সামাজিক উন্নতির নতুন ধাপ। ঔপনিবেশিক শোষণের সঙ্গে জড়িত ছিল (আমরা যেমন দেখেছি) পর্যায়-বিভাগের এক পদ্ধতি। ভারতের কিছু কিছু গোষ্ঠী এতে অন্যদের বঞ্চিত করে নিজেরা লাভবান হয়েছিল। ১৯০১-এর আদমশুমারির সময় থেকে 'দেশীয় জনমত কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক পূর্বদৃষ্টান্ত'-র ভিত্তিতে প্রতি দশক অন্তর বর্গকরণের চেষ্টা করে ব্রিটিশরাও তাতে সরাসরি সাহায্য করেছিল। এর অব্যবহিত ফল হিসেবে দাবি ও পাল্টা-দাবির বান ডাকে। কে বড়—সেই নিয়ে জাতের নেতারা গোঁতাগুঁতি করতে লাগল, জাত-ভিত্তিক সমিতি গড়ল—আর উদ্ভাবন করল পৌরাণিক জাতীয় 'ইতিহাস'। এই নতুন পরিস্থিতিতে অন্তত দুভাবে জাতের সংহতিতে ইন্ধন জোগানো হয়। জাতের সফল নেতৃস্থানীয় লোকেরা দেখেন, সামাজিক স্বীকৃতি, চাকরি ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণ আদায়ের লড়াইতে (যা স্বভাবতই বেশ সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থসর্বস্ব) জাতভাইদের সমর্থন জোগাড় করা দরকার। ১৮৮০-র দশক ইস্তক আস্তে আস্তে নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির সূচনা থেকে এই পদ্ধতিতে আরও বেশি উৎসাহ জুটে যায়। জাতের দরিদ্রতর লোকদের ক্ষেত্রে, মনে হয়, প্রায়শই জীবনে আরও সফল সহ-সদস্যদের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষণের এই যোগসূত্রই ছিল কঠোর ও ক্রমেই আরও বেশি বেগানা জগতে টিঁকে থাকার একমাত্র উপায়।

এক ধরনের জাত-সংহতির ভ্রান্ত-চেতনা; জাত নিয়ে রেষারেষি ও সংস্কৃতায়নের আন্দোলন—এগুলির মধ্যে দিয়ে সামাজিক-আর্থনীতিক টানাপোড়েনের অভিব্যক্তিই ছিল প্রায়শ এর নিট ফল। যেমন জৌনপুরের (পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ) এক গ্রাম নিয়ে বার্নার্ড কোন-এর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, চামাররা কীভাবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন শিব-নারায়ণ সম্প্রদায়ের ধর্মমতে। ব্রাহ্মণ্য রূপকে (যেমন, গোমাংস খাওয়ায় বাধানিষেধ) নকল করে তাঁরা তাঁদের সামাজিক অবস্থানকে ওপরে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রধানত ছোটো চাষী বা ভূমিহীন মজুর, এঁদের থাকতে হতো রাজপুত ঠাকুর জমি-মালিকদের তাঁবে। দেশের অন্য প্রান্তে, কেরলের অচ্ছুৎ এজাভারা বিশ শতকের গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণ প্রভুত্বকে আক্রমণ করার অনুপ্রেরনা পান নানু আসন (শ্রীনারায়ণ গুরু, আনু ১৮৫৪-১৯২৮)-এর কাছে। তাঁরা সব মন্দিরে ঢোকবার দাবি জানান আর নিজেদের কিছু রীতিনীতির সংস্কৃতায়নের চেষ্টা করেন। ঘটনাক্রমে পরবর্তীকালে এজাভারা হয়ে ওঠেন কেরলের কমিউনিস্টদের সবচেয়ে দৃঢ় সমর্থক। ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এতদূর অবধি বলেছেন যে, সময়ে সময়ে জাতি-ভিত্তিক সমিতি ছিল 'সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক জনগণের সংগ্রামে রুখে দাঁড়ানোর প্রথম রূপ', যদিও সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও যোগ করেছেন যে 'শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে হলে চাষীদের ওপর জাত-ভিত্তিক সংগঠনের কব্জা ভাঙতে হবে' (*ন্যাশনাল কোশ্চেন ইন কেরালা*, বোম্বাই, ১৯৫২, পৃ. ১-২)।

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর নাদার-দের উত্থান নিয়ে হার্ডগ্রেভ-এর বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, আদিতে যাঁদের 'শানান' বলা হতো, সেই অচ্ছুৎ মানুষরা তাড়ি তৈরি ও খেতমজুরের কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে বাণিজ্যজীবী একটি উঁচু স্তর গড়ে উঠল। ১৯০১-এর আদমশুমারিতে তাঁরা ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দাবি করলেন ও নিজেদের নাদার বলতে শুরু করলেন

Scanned with CamScanner

(শব্দটি আগে জমি ও তালগাছের মালিক শানানদের বোঝাতে ব্যবহার হতো)। ১৮৯৯-এ তাঁরা মন্দিরে ঢোকার অধিকার জাহির করলেন, সেই নিয়ে তিরুনাভেলিতে গুরুতর দাঙ্গা হয়। একইভাবে ১৮৭১ থেকে উত্তর-তামিলনাড়ুর পল্লী-রা নিজেদের ক্ষত্রিয় উৎস দাবি করেন এবং বন্নিয়া কুল ক্ষত্রিয় বলতে শুরু করেন ও বিধবার পুনর্বিবাহ-নিষেধের মতো ব্রাহ্মণ্য আচারপালন করতে আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রের মাহার-রা, পরে যাঁরা ছিলেন আম্বেডকরের আন্দোলনের মেরুদণ্ড স্বরূপ, উনিশ শতকের শেষ নাগাদ গোপাল বাবা ভালংকর নামে এক প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীর নেতৃত্বে জোট বাঁধতে শুরু করেন। ১৮৯৪ -এ ভালংকর এক আবেদনপত্রের মুসাবিদা করলেন। সেখানে তাঁদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করা হয় ও অধস্তন গ্রাম-কর্মচারীদের (চৌকিদার, স্থানীয় সালিশ, হরকরা, ঝাড়ুদার ইত্যাদি) জন্যে সেনাবাহিনী ও সরকারি চাকরিতে আরও বেশি কাজ চাওয়া হয়। এঁদের কিছু কিছু পরম্পরাগত পেশা ব্রিটিশ শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে কিছুকাল সামরিক চাকরি করে তাঁরা নতুন নতুন সুযোগও পান। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ব্যাপারে উত্তর-ভারতের 'সামরিক জাতিগুলি'র ওপর নতুন গুরুত্ব দেওয়াতেই মাহারদের জোট বাঁধার ব্যাপারে আগুনে ঘি পড়ে।

মোটের ওপর, আলোচ্য পর্বে বেশি ফলদায়ী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা ছিল মধ্যবর্তী স্তরের, যারা দ্বিজাতির নিচে ও অচ্ছুৎদের ওপরে। এদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় জমি-মালিক ও ধনী চাষীও ছিলেন, শহরে শিক্ষিত গোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ নাগাদ মহারাষ্ট্রে ও মাদ্রাজে চাকরি ও সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে ব্রাহ্মণদের সুস্পষ্ট প্রাধান্যের দরুণ ব্রাহ্মণ-বিরোধী নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছিল। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-বিরোধী দুন্দুভিতে প্রথম আওয়াজ তোলেন জ্যোতিবা ফুলে তাঁর বই *গুলামগিরি* (১৮৭২) ও তাঁর সংগঠন স ত্য শো ধ ক স মা জে র মধ্যে দিয়ে। 'ভণ্ড ব্রাহ্মণ ও তাদের সুবিধাবাদী শাস্ত্রের কবল থেকে নিচু জাতদের' রক্ষা করা দরকার —এ কথাই সেখানে বলা হয়। নিচু মালি জাতের এক শহুরে-শিক্ষিত মানুষ শুরু করেন এই আন্দোলন, পরে তা কৃষকপ্রধান জাতি-সমবায়ের মধ্যে কিছুটা শেকড় গাড়ে। গেল ওমভেট-এর মূল্যবান্ সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় (*কাল্চারাল রিভোল্ট ইন এ কলোনিয়াল সোসাইটি : দি নন্-ব্রাহ্মণ মুভমেন্ট ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৭৩-১৯৩০*) সত্যশোধক আন্দোলনের ভেতরকার এক দ্বিধার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে 'এক শিরোমণি ভিত্তিক রক্ষণশীল ধারা ও আরও আকাঁড়া এক গণ-ভিত্তিক র‍্যাডিকালিজম'—দুই-ই ছিল। প্রথমটির বিকাশ ঘটে নরমপন্থী 'সংস্কৃতায়নে'র পথ ধরে, মারাঠাদের ক্ষত্রিয় উৎসের কথা মাঝে মধ্যে দাবি করা হয়। ১৮৯০-এর দশক থেকে তা কোল্হাপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষণ পেতে থাকে। এটি ছিল খোলাখুলিই রাজভক্ত ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভেদমূলক। টিলকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা তাতাচ্ছিল কোল্হাপুরকে আর ১৯১৯-এর পর ভাস্কররাও যাদবের অ-ব্রাহ্মণ দল ছিল প্রচণ্ড কংগ্রেস-বিরোধী। কিন্তু দ্বিতীয় একটি ধারাও ছিল। সেটি কাজ করত শহরে নয়, গ্রামে (উনিশ শতকের অন্যান্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বেশির ভাগ থেকেই যা আলাদা), আর ইংরিজির বদলে ব্যবহার হতো মারাঠি। এই ধারাটি খোদ জাত-ব্যবস্থাকেই আক্রমণ করেছিল, শুধুই তার মধ্যে উঁচু মর্যাদা দাবি করে নি। 'শেঠজী ভাটজী' (মহাজন ও ব্রাহ্মণ)-র বিরুদ্ধে এঁরা 'বহুজন সমাজে'র মুখপাত্র হওয়ার

Scanned with CamScanner

এখতিয়ার চাইতেন। ১৯১৯-২১-এ সাতারায় কৃষক-উত্থানকে তা অনুপ্রাণিত করে ও পরে গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে গান্ধীপন্থী কংগ্রেসকে পুনর্জীবিত করার সহায় হয়। অল্প কিছু পরে দেখা যায় প্রায় একই ধরনের ছক। শিক্ষা ও চাকরিতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যার ৩.২% ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু ১৮৭০ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০% স্নাতক ছিলেন তাঁরাই)। সে-আধিপত্য শিক্ষিত তামিল ভেল্লালা, তেলেগু রেড্ডি ও কাম্মা, ও মালয়ালি নায়ারদের চ্যালেঞ্জ-এর মুখে পড়ে। ডিসেম্বর ১৯১৬-র অ-ব্রাহ্মণ ইশ্‌তেহার-এ এই চ্যালেঞ্জ-এর উপ-শিরোমণি চরিত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে প্রায়ই বলা হয়েছে, অ-ব্রাহ্মণরাই 'করদাতাদের বড় অংশ, তার গরিষ্ঠ ভাগই জমিনদার, জমি-মালিক, ও কৃষিজীবী...'। পরিণামে যা এক ধরনের 'দ্রাবিড়ীয়' বা তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদ হয়ে দাঁড়াল, তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ব্রিটিশরাই। ইশচিক-এর পর্যালোচনায় তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। ১৯২০-র ও '৩০-এর দশকের জাস্টিস (ন্যায়বিচার) দলের ক্ষেত্রে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার অনেক আগে, ১৮৮৬-তে মাদ্রাজের এক লাটের সমাবর্তন-ভাষণটি পড়তে ইন্টারেস্টিং লাগে : 'তোমরা বিশুদ্ধ দ্রাবিড় জাতি (রেস)। তোমাদের মধ্যে সংস্কৃত-পূর্ব উপাদানটি আরও বেশি আত্ম-পরিব্যক্ত হচ্ছে—এটাই আমি দেখতে চাই। ... আমাদের, ইংরেজদের চেয়ে তোমাদের সঙ্গে সংস্কৃত-র যোগ আরও কম। বদমাশ ইওরোপীয়রা কখনও কখনও ভারতীয় অধিবাসীদের "নিগার" (কেলে) বলে—এমন শোনা যায়। কিন্তু গর্বিত সংস্কৃত-ভাষী বা লেখকদের মতো তারা দাক্ষিণাত্যের লোকদের বাঁদরের পাল বলে না।' অন্য নানা ধরনের ভেতরকার টানা-পোড়েনের মতো (জাত, ধর্ম, অঞ্চল বা শ্রেণী যা-ই হোক) এ ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীরা সুকৌশলে বাস্তব ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েছিল খণ্ড-চেতনার লালনে। সেই সঙ্গে, মহারাষ্ট্রের মতো তামিলনাড়ুতে সামাজিক দিক দিয়ে র‍্যাডিকাল কিছু সম্ভাবনাও একেবারে গরহাজির ছিল না। ১৯২০-র দশকের সংগ্রামী, প্রায়শই নিরীশ্বরবাদী, আ ত্ম-ম র্যা দা আন্দোলনের উন্মেষ থেকেই তা দেখা যায়। সব রকম জাত-ভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতায়নে'র মার্কা মারাটা সত্যিই ঠিক নয়। সময়বিশেষে কিছু কিছু আন্দোলন জাতের ভিতকেই চ্যালেঞ্জ করেছিল।

উত্তর ও পূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ-আধিপত্য এতটা স্পষ্ট ছিল না। এখানে অন্যক'টি উঁচু-জাতগোষ্ঠী ঘাত-নিরোধকের কাজ করত (যেমন যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে রাজপুত ও কায়স্থ, আর বাঙলায় কায়স্থ ও বৈদ্য)। জাত-অনুযায়ী জোট এখানে কিছুটা পরে দেখা দেয়, যদিও আজ এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃপ্রাদেশিক বৃত্তিগত যোগাযোগের দরুন কায়স্থরা ইতোমধ্যেই একটি সর্বভারতীয় সমিতি ও সংবাদপত্র (এলাহাবাদ-কেন্দ্রিক *কায়স্থ সমাচার*) বার করছিল ১৯০০ নাগাদ। বাঙলায় নিচু জাতের সমিতিগুলি গুরুত্ব পেতে থাকে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে। কিছু স্থানীয় জমিনদার, কয়েকজন কলকাতাবাসী আইনজীবী ও ব্যবসাদারের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের অবস্থাপন্ন কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলতে শুরু করেন। ১৮৯৭-এ তাঁরা একটি জাতি নির্ধারণী সভা ও ১৯০১-এর আদমশুমারির সময়ে কেন্দ্রীয় মাহিষ্য সমিতির পত্তন করেন। পরে, মেদিনীপুরের মাহিষ্যরা জাতপাতের আন্দোলনে লক্ষণীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের ভেদ-ও-শাসন নীতি অনেক বেশি সফল হয়েছিল ফরিদপুরের নমশূদ্রদের ক্ষেত্রে। ১৯০১-এর

Scanned with CamScanner

পর শিক্ষিত লোকদের একটি ছোট্টো শিরোমণি গোষ্ঠীর ও কিছুটা মিশনারিদের উৎসাহে এঁরা সেখানে সমিতি গড়তে শুরু করেন। মেদিনীপুরের মাহিষ্যরা ছিলেন স্থানীয়ভাবে প্রতিপত্তিশালী জাত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছোটো জমি-মালিক, ও বিরাট সংখ্যক সম্পন্ন ও গরিব চাষী। আর নমশূদ্ররা ছিলেন অচ্ছুৎ গরিব চাষী। দূরের ব্রিটিশ প্রভুর চেয়ে উঁচু জাতের বাবুদেরই এঁরা আরও কাছের শত্রু বলে মনে করতেন—দু-এর বৈপরীত্যের কিছুটা ব্যাখ্যা হয়তো এখান থেকেই পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক চেতনা

উপনিবেশবাদের হাতে লালিত আর প্রায়শই প্রত্যক্ষভাবে পালিত দ্বিতীয় এক বড় ধরনের খণ্ড-চেতনা হলো ধর্মীয় বিভাগ—হিন্দু ও মুসলিম 'সাম্প্রদায়িকতা'। বিশ শতকে গড়ে-ওঠা দুটি উল্টো বাঁধাছকের দরুন অত্যন্ত জটিল এই বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা যথেষ্ট বাধা পেয়েছে। একটি হলো সাম্প্রদায়িকতাবাদী পূর্ব-ধারণা যে, হিন্দু ও মুসলমানরা সমসত্ত্ব ও অনিবার্যভাবেই বৈরী দুটি সত্তা, মধ্যযুগ থেকেই দুটি 'জাতি'। আর অন্যটি হলো পরিপূর্ণ সৌহার্দ্যের এক স্বর্ণযুগ নিয়ে জাতীয়তাবাদী পাল্টা-অতিকথা, যা একমাত্র ব্রিটিশ ভেদ-ও-শাসনের দরুনই গেছে ভেঙে। দুটি বাঁধাছকেই ধরে নেওয়া হয় যে, সারা দেশেই এক বা একাধিক ধরনের সংহতি ও অভিন্ন রূপ ছিল—উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যোগাযোগের উন্নতি ও আর্থনীতিক সংযোগ গড়ে ওঠার আগে যা প্রায় একান্তই অসম্ভব। আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা—দুই-ই সারগতভাবে আধুনিক ব্যাপার। আগের শতকগুলোয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মাঝে মাঝে স্থানীয় সঙ্ঘর্ষের নজির নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যেমন পাওয়া যাবে শিয়া-সুন্নি সঙ্ঘাত জাত-পাত ঘটিত বিবাদের অজস্র নজির। কিন্তু ১৮৮০-র দশক অবধি, মনে হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ রকমে বিরল। ১৯৪৪-এ কুপল্যান্ড একটা বড় নজির পান : বেনারসে ১৮০৯-এর দাঙ্গা (হিন্দুরা নাকি সেখানে ৫০টি মসজিদ ধ্বংস করেছিল)। তার পরের বড় দাঙ্গার নজির অনেক পরে, ১৮৭১-৭২-এ। ১৮৮৫ থেকে পরপর দাঙ্গা চলতেই থাকে (আর কুপল্যান্ড, *কন্সটিটিউশনাল প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ২৯)। কুপল্যান্ড ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের বিদ্বান, তাঁর তরফে নিশ্চয়ই বিষয়টিকে ছোটো করে দেখানোর কোনো কারণ নেই (তিনি এমনকি এও বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যাই 'ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকার কারণ')।

সাম্প্রদায়িকতার অনেকটাই যে চাকরি ও রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যের জন্যে শিরোমণি-সঙ্ঘাত থেকেই গজায়—বহুদিন থেকেই তা স্বতঃস্পষ্ট সত্য, আর বিদ্বান্‌রা সাধারণত শুধু এই স্তরেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছেন। যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের বিষয়ে ফ্রান্সিস রবিনসন-এর বিস্তারিত কাজটির অভিকেন্দ্র ছিল 'রাজনীতি করায় ব্যাপৃত বিভিন্ন শিরোমণি গোষ্ঠী' (*সেপারেটিজম্ অ্যামাং ইন্ডিয়ান মুসলিম*, পৃ. ৬)। সেই সুবাদে গণ-দাঙ্গাগুলোকে অনায়াসে আলোচ্য বিষয়ের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিরোমণিদের সাম্প্রদায়িকতার নানা উৎস নিয়ে পরের অংশে আলোচনা করা হবে—ঐতিহাসিকভাবে তার সমকালীন, বুদ্ধিবৃত্তিজীবী বা 'মধ্যশ্রেণী'র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। কিন্তু, গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িকতা একটা গণ-মাত্রা অর্জন করেছিল—

Scanned with CamScanner